সার্ধশতবার্ষিক স্মরণ

বিজ্ঞানানন্দজীর দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীমা এবং মায়ের মেয়েরা

প্রব্রাজিকা নির্বেদপ্রাণা

‘গুপ্ত ব্রহ্মজ্ঞানী’ স্বামী বিজ্ঞানানন্দের আন্তর জীবনের প্রজ্ঞায় এবং ধ্যানদৃষ্টির গভীরতায় শ্রীমা সারদা দেবী যে কোন অপূর্ব আলোয় বিভাসিতা ছিলেন তা সাধারণ মানুষের অনুভব-সীমার বাইরে; তাই, কেবল তাঁর জীবনবৃত্তটি পরিক্রমা করে দেখতে চেষ্টা করব রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের এই উজ্জ্বল নক্ষত্রের কিরণ সঙ্ঘনেত্রীর চরণস্পর্শ করার পর কীভাবে জগতের সব নারীর উপর করুণাধারায় বিগলিত হয়ে ঝরে পড়েছিল।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ যখন মাঝে মাঝে ভুবনেশ্বর থেকে বেলুড় মঠে এসে থাকতেন, মঠে তখন আধ্যাত্মিক ভাবতরঙ্গের ঢেউ খেলে যেত। সেইসময় বিজ্ঞানানন্দ মহারাজও প্রায়ই মঠে আসতেন। কিন্তু তিনি লোকজনদের সঙ্গে, এমনকী মঠের সাধুদের সঙ্গেও বড় একটা মেলামেশা করতেন না, আত্মানন্দেই বিভোর থাকতেন। কখনও কখনও রাজা মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ বা অন্যান্য গুরুভাইদের সঙ্গে সেই ভাব বিনিময় করতেন। এই আনন্দের হাটে যোগ দিতে অনেক ভক্তও মঠে আসতেন কিন্তু বিজ্ঞান মহারাজকে দর্শন করা অনেকের ভাগ্যেই ঘটত না। অনেকে তাঁকে চিনতেনও না, কারণ বেশিরভাগ সময় তিনি এলাহাবাদে নির্জনেই থাকতেন। রাজা মহারাজ কোনও কোনও ভক্তকে বলতেন, ‘‘যাও, যাও, ঐ মহাপুরুষকে দর্শন করে এসো।... বস্তু লাভ করে বসে আছেন। ব্রহ্মজ্ঞান তাঁর মুঠোর ভেতর।... উনি বড় একটা ধরা দিতে চান না।”[১]

ধরা দেবেনই বা কেন? জীবনের প্রথম লগ্নেই তো তাঁর আরাধ্য দেবতা বলে দিয়েছিলেন—‘‘খুব সাবধানে থাকবি। সংসারের আঁচটিও যেন গায়ে না লাগে।... তোরা হলি মায়ের লোক; তাঁর অনেক কাজ তোদের করতে হবে।”[২] শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন তাঁকে আরও বলেছিলেন, ‘‘দেখ, মেয়েমানুষের দিক মাড়াসনি।... সোনার মেয়েমানুষ ভক্তিতে গড়াগড়ি দিলেও সেদিকে ফিরে তাকাবিনি।”[৩] তাই দেখা যেত স্ত্রীজাতির সান্নিধ্য সম্বন্ধে তিনি খুব হুঁশিয়ার ছিলেন। সঙ্ঘের অধ্যক্ষ হওয়ার আগে পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। এলাহাবাদ মঠে গোয়ালিনি, চাকরানিরও প্রবেশাধিকার ছিল না। একবার আশ্রমের কাজে

নিযুক্ত মেথর নিজে না এসে তার মেয়েকে কাজের জন্য পাঠালে তার চাকরি চলে যায়। পরে মেথর এসে যখন অনেক অনুনয়-বিনয় করে তখন তাকে কথা দিতে হয় যে, হয় সে নিজে কাজ করবে অথবা কোনও পুরুষকে পাঠাবে—মহিলা কদাপি নয়।

একবার মহারাজের একমাত্র জীবিতা সহোদরা বহু বছর তাঁকে না দেখে ব্যাকুল হয়ে পাটনা থেকে এলাহাবাদ আসেন তাঁকে দেখতে। কথাবার্তার পর মহারাজ সেবককে বললেন, ‘‘যাও, এখনই একে ধর্মশালায় রেখে এসো। এখানে স্ত্রীলোকের থাকা হবে না।’’[৪] স্ত্রী-ভক্তরা এলে তিনি দাঁড়িয়ে দু-চারটি কথা বলে বিদায় দিতেন বা নিজে চলে যেতেন। মুঠিগঞ্জ সেবাশ্রমের জন্য খোলার চালের ঘরের বিরাট লম্বা একটা বাড়ি কেনা হয়েছিল, সেখানে অনেক দরিদ্র পরিবার ভাড়া থাকতেন। মেরামত করার জন্য একবার মহারাজের ওই বাড়ির ভেতরে যাওয়ার দরকার হয়, কিন্তু বারবার চেষ্টা করেও তিনি ভেতরে যেতে পারেননি। শেষে বলেছিলেন, ‘‘ভেতরে যাবার জন্য আমিও খুব চেষ্টা করেছি। কিন্তু ফটকের কাছে গেলেই কে যেন আমায় ভেতর থেকে ঠেলে বের করে দেয়। এই বর্জনীয় আবেষ্টনীর মধ্যে যেতে আমার মন চায় না।’’[৫] তিনি ব্রহ্মচর্যে এতটাই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন যে, বলতেন স্বপ্নেও কখনও নারীমুখ দর্শন করেননি। সন্ন্যাসের কঠোর আদর্শের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। বিশিষ্ট মানুষদের প্রতি ব্যবহারেও এর কোনও ব্যতিক্রম হত না। কোনও মার্কিন মহিলা একবার মহারাজের অনুপস্থিতিতে এলাহাবাদ মঠে অতিথি হন। মহারাজ যেদিন ফিরলেন, সেদিন স্টেশনে বহু লোকের সামনেই তাঁকে বলেছিলেন, ‘‘কেন আশ্রমে আছ? এখনই বাইরে যাও।’’ আশ্রমে ফিরে তাঁর অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করে দেন।[৬]

এ-হেন বিজ্ঞানানন্দজী মেয়েদের সঙ্গে, বিশেষত বিদেশিনিদের সঙ্গে স্বামীজীর মেলামেশা দেখে সন্দিগ্ধ হয়েছিলেন। আবার সন্দেহ নিরসনের জন্য গিয়েছিলেন স্বামীজীর কাছেই। তাঁর অভিযোগ শুনে স্বামীজী বলেছিলেন, ‘‘দ্যাখ পেসন, ঠাকুরকে তুই যতটুকু বুঝেছিস, ঠাকুর কি ততটুকুই? আর তুই ঠাকুরকে কতটুকুই বা বুঝেছিস! জানিস, ঠাকুর আমার স্ত্রী-পুরুষের ভেদ মেরে দিয়েছেন। আত্মাতে আবার স্ত্রী-পুরুষ কিরে? তাছাড়া ঠাকুর এসেছেন সারা দুনিয়ার জন্য। তিনি কি বেছে বেছে কেবল পুরুষদের উদ্ধার করতেই এসেছেন?... আমায় তিনি নিজে হাত ধরে যা-ই করাচ্ছেন, তা-ই আমি করছি।’’[৭] স্বামীজীর উত্তেজিত মূর্তি দেখে বিজ্ঞান মহারাজ তো ভয়ে জড়সড়—বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছে না। তাই দেখে স্বামীজীর যেন দয়া হল। তিনি একটু হেসে বললেন, ‘‘মেয়েদের ভেতর সেই আত্মশক্তি না জাগলে কি কখনও কোনও জাত জাগে, না কোনও জাত উঠতে পারে?—আমি তো সারা দুনিয়াটা ঘুরে দেখলুম। সব দেশেই মেয়েদের প্রায় একই অবস্থা।... তাই তো মা এসেছেন। মায়ের আসার পর থেকেই সব দেশের মেয়েদের ভেতর জাগরণের সাড়া পড়ে গেছে।’’[৮]

স্বামীজীর কথায় এমন জোর ছিল যে বিজ্ঞান মহারাজ তাঁর উপর কিছু বলতে সাহস করলেন না। কিন্তু মনে মনে ভাবলেন, ‘‘ঠাকুর আমায় যেমন বলেছেন আমি তেমনই করে যাব। স্বামীজীর কথা স্বতন্ত্র।... স্বামীজী একজনই হন। আমরা তো আর স্বামাজী হতে পারব না।’’[৯]

গত শতাব্দীর ত্রিশ দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত তিনি সৌজন্যের খাতিরেও মেয়েদের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন না। লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। একবার বিজ্ঞান মহারাজ ঢাকা কেন্দ্রে গেছেন। ওখানকার একটি ঘরে

কয়েকজন মহিলা মহারাজকে প্রণাম করবেন বলে অপেক্ষা করছেন। মহারাজের আপত্তি জেনেও একজন সাধু খুব অনুনয় করে তাঁকে বললেন, ‘‘... মহিলারা সবাই ভক্ত! আপনাকে শুধু প্রণাম করে যাবেন।’’ মহারাজ বললেন, ‘‘প্রণাম করবেনই! আচ্ছা বেশ।’’ এই বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর মহিলারা যে-মুহূর্তে ঘরে ঢুকেছেন, মহারাজজী পেছন ফিরে বসলেন। বললেন, ‘‘বেশ, আপনারা প্রণাম করুন, আর কী প্রশ্ন করবেন, করুন।’’[১০] মহিলাদের মুখদর্শন করবার ভয় আর রইল না। কে কী মনে করবে এসব তিনি ভাবতেন না। গুরুবাক্য আক্ষরিক অর্থে বিনা বিচারে পালনের এই নিষ্ঠা, এই কঠোরতার দৃষ্টান্ত বিরল। একবার বিদেশিনি ভক্ত ‘সিস্টার ভক্তি’ (যিনি বেলুড় মঠের মন্দিরের ব্যয়ের বেশিরভাগটাই দেন) এলাহাবাদে এসেছেন এবং শহরের একটি হোটেলে উঠেছেন। মহারাজ কদিনের জন্য শহরের বাইরে গিয়েছিলেন। যেদিন ফিরলেন, অন্যদের সঙ্গে সিস্টার ভক্তিও স্টেশনে গেছেন মহারাজকে আনতে। মহারাজ তাঁকে দেখেই গম্ভীর। কোনও মহিলা একজন সন্ন্যাসীকে অভ্যর্থনা জানাতে আসবেন, এ তাঁর অভিপ্রেত নয়।[১১]

‘নারী সাধকজীবনে বিঘ্নস্বরূপ’ এরকম একটা বোধ তাঁর প্রথম থেকেই ছিল। তখনও তিনি চাকরি ছেড়ে মঠে যোগ দেননি কিন্তু বিবাহ যে করবেন না—এ একেবারে স্থির সিদ্ধান্ত। এদিকে ছেলে ভাল সরকারি কাজে যোগ দেওয়ার পর থেকে বিবাহের জন্য অভিভাবকদের পীড়াপীড়ি আরও বেড়ে গেল। হরিপ্রসন্ন তখন এটোয়ায়। জ্যাঠামশাই টেলিগ্রাম পাঠালেন মায়ের কঠিন অসুখ, অবিলম্বে যেন সে উপস্থিত হয়। এদিকে যেদিন তাঁর বেলঘরিয়ার বাড়িতে এসে পৌঁছনোর কথা সেদিন সকালেই মনোনীত পাত্রীকে এনে একটি ঘরে বসিয়ে রাখা হয়েছে। হরিপ্রসন্ন বাড়ি পৌঁছেই মা কেমন আছেন জানতে চেয়ে দেখলেন মা সম্পূর্ণ সুস্থ। বিস্মিত, বিভ্রান্ত ছেলের হাত ধরে মা বিশেষ ঘরটির সামনে নিয়ে এলেন এবং ঘরের ভেজানো দরজা খুলে সুসজ্জিতা, সালংকারা মেয়েটিকে দেখিয়ে জানতে চাইলেন বধূ হিসাবে পছন্দ কি না! হরিপ্রসন্ন মেয়েটির পায়ের দিকে তাকিয়ে তাকে ‘মা’ সম্বোধন করে ঘরের বাইরে থেকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করলেন। তারপর আর একমুহূর্তও অপেক্ষা না করে, ‘মা আমি চললাম’ বলে মাকে প্রণাম করে বাগানে এসে পাঁচিল ডিঙিয়ে (কারণ সদর দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করা ছিল) গৃহত্যাগ করলেন।[১২] এই আজন্ম-ব্রহ্মচারীর ক্ষণমাত্র সঙ্গ এবং বৈরাগ্যপূর্ণ ‘মা’ ডাকে সেই ভাগ্যবতী মেয়েটির সংসার-বাসনাও বোধহয় চিরতরে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল; কারণ কন্যাপক্ষের সামাজিক মুখরক্ষার জন্য হরিপ্রসন্নের ছোটভাইয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হলেও তিনি কিন্তু পিতৃগৃহে ফিরে গিয়ে আজীবন ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন করে গেছেন। হরিপ্রসন্ন মঠে যোগদানের পর আর মায়ের সামনেও আসতে চাইতেন না, পাছে তাঁর সন্ন্যাসজীবনে নতুন কোনও বাধার সৃষ্টি হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের দীক্ষিত সন্তান স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বলতেন, ‘‘ঠাকুর চৈতন্যস্বরূপ আর মা হচ্ছেন চিন্তাস্বরূপিণী।’’[১৩] ‘‘মা সর্বশক্তিময়ী।’’[১৪] কিন্তু এই সর্বশক্তিময়ীর ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার সম্বন্ধে তিনি প্রথমে তেমন ওয়াকিবহাল ছিলেন না। মাকে কেবল গুরুপত্নী বলেই তাঁর ধারণা ছিল। এই ভ্রান্তি সম্পূর্ণ মুছে দেন স্বামীজী। শ্রীশ্রীমা যে স্বয়ং জগন্মাতা এই বোধে বিজ্ঞানানন্দকে প্রতিষ্ঠিত করেন তিনি নিজে। সেবার বলরামবাবুর বাড়িতে শ্রীশ্রীমা রয়েছেন, স্বামীজীও আছেন। সকলেই মাকে প্রণাম করতে যাচ্ছেন। বিজ্ঞানানন্দজী বসে আছেন স্বামীজীর কাছে। স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন—‘‘পেসন, মাকে প্রণাম করতে গিয়েছিলে?’’ তিনি বললেন, ‘‘না

মশায়।” কথাটার মধ্যে হয়তো কিছুটা উদাসীনতা ছিল। স্বামীজী ব্যস্ত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আদেশ করলেন—‘‘এক্ষুনি যাও, প্রণাম করে এসো।” স্বামীজীর আদেশে তিনি তো মাকে প্রণাম করতে গেলেন, কিন্তু স্বামীজী বলেছেন তাই যাওয়া। মনে মনে ভাবছেন কোনওরকমে টিপ করে একটা প্রণাম করে চলে আসবেন। এদিকে যেই মাকে হাঁটুগেড়ে প্রণাম করে উঠেছেন, শুনছেন স্বামীজী পেছন থেকে বলছেন (স্বামীজী যে পেছন পেছন আসবেন তা তিনি ভাবতেও পারেননি), ‘‘সে কি পেসন, সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করো; মা যে সাক্ষাৎ জগদম্বা।”[১৫]—বলে নিজে সাষ্টাঙ্গ হয়ে মাকে প্রণাম করে শিখিয়ে দিলেন মাকে কেমন করে প্রণাম করতে হয়। সেদিন থেকে বিজ্ঞান মহারাজ মাকে শুধু জগন্মাতা বলেই জানলেন না—বুঝলেন মা যে কত আপনার!

১৯৩৩ সালে এলাহাবাদে ভক্তদের কাছে এই ঘটনাটি বর্ণনা করার সময় মহারাজ বলেছিলেন, ‘‘মায়ের নাম জপ করি—‘মা আনন্দময়ী’ বলে। মার নামের একটি বিশেষগুণ আছে। তিনি স্ত্রীলোক থেকে আর তাদের কুভাবে দেখার হাত থেকে রক্ষা করেন। এটি আমি বেশ অনুভব করেছি। তাঁর নামেতে ভক্তি, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, বুদ্ধি, ধন, দৌলত সবই লাভ হয়।ঁচণ্ডীতেও আছে—তিনি ঋদ্ধি সিদ্ধি সব দিতে পারেন। ঠাকুরের নামের চাইতে মায়ের নামে আমি বল পাই বেশী।”[১৬] ‘‘ঠাকুরের ভিতর যে আধ্যাত্মিকশক্তি সদা সর্বদা খেলা করত, তার কাছে অন্য সব শক্তি হার মেনে যেত; কাম ক্রোধ সব সেই শক্তির কাছে কেঁচো! এসব রিপুদের দমন করতে হলে ঐ শক্তির কথা ভাবতে হয়... মাকে স্মরণ করতে হয়। তা হলে মন থেকে ওসব হীনভাব চলে যাবে।”[১৭] বিজ্ঞানানন্দজী আরও বলতেন, ‘‘শক্তিপূজা করা বড় শক্ত। ঠাকুর ও মার কৃপা আছে বলেই আমাদের সঙ্ঘের মধ্যে সাধুরা শক্তিপূজায় সিদ্ধ হতে পারছে।”[১৮]

শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমা যে অভেদ—বিজ্ঞান মহারাজ এই তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যকে একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘ঠাকুরের কাছে মন্ত্র নেওয়া আর মার কাছে মন্ত্র নেওয়ায় কোন তফাৎ নেই। ঠাকুর আর মা কি ভিন্ন? আমি তো মার নামেও মন্ত্র দিয়ে থাকি।”[১৯] এই প্রসঙ্গে পূজনীয় স্বামী আত্মস্থানন্দ মহারাজের একটি অপূর্ব উপলব্ধির কথা মনে পড়ে। তাঁর গুরু বিজ্ঞানানন্দজী তাঁকেও দুটি মন্ত্র দিয়েছিলেন—একটি ঠাকুরের, একটি মায়ের। এদিকে মহারাজের ঠাকুরের মন্ত্রটি জপধ্যানের সময় বেশ ভাব-অনুভূতি হয় কিন্তু মায়ের মন্ত্রে কিছুই হয় না। মনে একটা অশান্তি। তারপর একদিন মা তাঁকে বোঝালেন—‘‘কী করে হবে, তুই তো আমাকে ঘেন্না করিস!” মহারাজ বুঝতে পারলেন, কঠোর বৈরাগ্যের প্রেরণায় মেয়েদের প্রতি একটা উন্নাসিকতা বা অবহেলার ভাব তো তাঁর মনে আছেই। কিন্তু মা যে জগতের সব মেয়ের মধ্যেই আছেন।

উপলব্ধিবান বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ ভক্তদের উপদেশ দিতেন এই বলে—শ্রীরামকৃষ্ণ আর শ্রীমা সারদা দেবীকে অভেদ দৃষ্টিতে দেখতে হবে। ‘‘মনে রাখবি, ঠাকুরের কৃপা না হলে মাকে পাওয়া যায় না, আবার মায়ের কৃপা না হলে ঠাকুরকে পাওয়া যায় না। ঠাকুর যেন নারায়ণ, মা যেন লক্ষ্মী।”[২০] বুঝিয়ে দিতেন—শক্তির এলাকা যাঁর, তাঁর কাছেই শক্তি চাইতে হয়। শক্তি না হলে কোনও কাজ হয় না। তিনি সাধুদের বলতেন, সমস্ত সংস্কারের পুঁটলি ফেলে দিয়ে দেহমনপ্রাণ শ্রীভগবানের চরণে, শ্রীশ্রীমায়ের চরণে সম্পূর্ণ সমর্পণ করতে পারাই সন্ন্যাসজীবন। তিন বার ঠাকুরের এবং তিন বার মায়ের নাম মালায় জপ করে সেটি মাথায় ঠেকিয়ে ভক্তদের মালা শোধন

করে দিতেন। একবার এক ব্রহ্মচারীকে বিজ্ঞান মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি ঠাকুরকে ভালবাসেন না মাকে। উত্তর এল, ‘‘দু-জনকেই ভালবাসি।” মহারাজ বললেন,‘‘তাহলে ঠিক আছে। ঠাকুর হলেন—রাম ও কৃষ্ণ, আর মা হলেন—সীতা ও যোগমায়া।”[২১]

বাল্মীকি রামায়ণ ইংরেজিতে অনুবাদ করার সময় বিজ্ঞানানন্দজী প্রায় সর্বক্ষণই রামসীতার ভাবে তন্ময় হয়ে থাকতেন। তাঁর বইতে রামচন্দ্র আর সীতা দেবীর ছবির পাশাপাশি শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা দেবীর ছবিও ছাপা হয়েছিল। রামায়ণে ঠাকুর ও মায়ের ছবি কেন দিলেন এ-প্রশ্ন করাতে মহারাজ জানান : কিছুদিন আগে তিনি উত্তরপ্রদেশে এক ভক্তের বাড়িতে গিয়েছিলেন। ওই ভক্তের ইষ্টদেবতা শ্রীরামচন্দ্র। তাঁর ঠাকুরঘরের বেদিতে রামচন্দ্র আর সীতামায়ের পট ছিল। মহারাজ স্নানের পর ঠাকুরঘরে এসে রামচন্দ্র আর মা সীতাকে প্রণাম করে মুখ তুলে দেখেন তাঁদের স্থানে ঠাকুর ও মা বসে আছেন। সেই দর্শন ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। মহারাজ বলতেন, শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে যা দেখিয়ে দিয়েছেন তিনিও তাঁর অনুবাদগ্রন্থে তাই প্রকাশ করেছেন।[২২]

বিজ্ঞান মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণের মতো মায়ের আশীর্বাদও যে পেয়েছিলেন সেকথা নিজমুখে বিভূতিবাবুকে বলেছিলেন। তখনও তিনি মাকে দর্শন করেননি, দর্শন করতে গিয়েছেন। মহারাজ বলেন, ‘‘মা উপরে রয়েচেন, আমি নীচের তলায় বসে। আমার হৃৎপদ্ম ফুটে উঠল!” ‘‘শরতের বৈঠকে বসে আছি। ওপোর থেকে মাকে পেন্নাম করবার ডাক এলো।... এক এক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠছি—অন্তরে এক এক করে সঙ্গে সঙ্গে এক একটি পদ্ম (চক্র) ফুটে উঠছে। পরমানন্দে গোটা দেহমন ভরে উঠলো।”[২৩]

বিজ্ঞানানন্দজী জানতেন দয়াময়ী মায়ের আশ্রয় নিলেই সব হয়ে যাবে। তিনি দয়া করেন সহজেই। তাই মায়ের কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলতেন, ‘‘মাকে ডাকবে।... একেবারে ঠিক ঠিক না হলে তাঁর (ঠাকুরের) কৃপা হয় না। মা বড় ভাল। ঠাকুর মাকে দেখিয়ে আমাকে বলেছিলেন, ‘এঁকে ডাকবি।’ তাতেই আমার সব হয়ে গেল।”[২৪] একবার যখন বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ দীক্ষা দিচ্ছেন তখন ঠাকুর তাঁকে দর্শন দিয়ে মায়ের কথা বলতে বলেছিলেন কারণ ‘মা-র কাছেই তো মুক্তির চাবি।’ তখন থেকে দীক্ষার সময় তিনি শ্রীঠাকুর ও মা দুজনেরই মন্ত্র দিতেন। মাতৃবৎসল এই বালক বলতেন, ‘‘এ বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সবই মা ধারণ করে আছেন। তিনি তোমাদেরও রক্ষা করছেন, তাঁকে ডাক আর না-ই ডাক। তবে ডাকলে আরও আনন্দ পাবে, সেই আনন্দময়ীর আনন্দে বিভোর হবে।... মাকে কায়মনোবাক্যে ডাকতে পারলে যে কী আনন্দ...।”[২৫]

মহারাজের সরল স্বীকারোক্তি : ‘‘পূর্বে ভগবানকে পিতৃভাবে আরাধনা করবারই ঝোঁক ছিল। মাকে ভক্তিশ্রদ্ধা সবই করতাম কিন্তু বাপের দিকেই টান ছিল বেশী। এখন ‘মা’ ‘মা’ বলি সকাল সন্ধ্যায়—আর মনে হয়, ঠিক যেন মায়ের কোলের শিশুর মতন আছি। তাঁর কোলেই বসে রয়েছি।”[২৬] পরবর্তী কালে মহারাজকে দেখে মনে হত তিনি যেন মায়ের সত্তা পেয়েছেন। শরীর ত্যাগের আগের কুড়ি-একুশ দিন প্রায় বিনা চিকিৎসায় তিনি শুধু মাকে আশ্রয় করে কাটিয়েছেন। সেইসময় তাঁর ঘর থেকে সদা-সর্বদা কেবল ‘মা মা’ শব্দ ভেসে আসত। মাকে ধরে কেমন করে জীবন কাটাতে হয়, কেমন করে মায়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে পড়ে থাকা যায়—এটি তিনি নিজের জীবন দিয়ে শিখিয়ে গেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ অথবা সাধুজীবনের কঠোরতা—যেকোনও কারণেই হোক, লোকাচারে

নারী সম্পর্কে অমন অনমনীয় ভাব প্রকাশ করলেও সেই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের মূলত কোনও পার্থক্য ছিল না। একবার স্বামী জ্ঞানদানন্দ এই আপাত-কঠোর সন্ন্যাসীকে বলেছিলেন, ‘‘শুনেছি মহাপুরুষ মহারাজ বলতেন, আপনার ওখানে (এলাহাবাদ আশ্রমে) মেয়ে-মাছিটির পর্যন্ত প্রবেশের অধিকার নেই। এখন তো দেখছি আপনি স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে দীক্ষা দিচ্ছেন। এর কারণ কি?’’ উত্তরে মহারাজ বললেন, ‘‘মহাপুরুষ মহারাজ আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। সেই সময় তাঁর করুণাশক্তি আমার ভিতর প্রবেশ করে এই পরিবর্তন এনেছে।’’[২৭]

‘‘মহাপুরুষ মহারাজকে তো দেখেছ? তাঁর শেষ জীবনে তিনি যেন করুণার অবতার হয়ে গিয়েছিলেন।... মহাপুরুষজীর সেই ভাবটিই আমার ভিতরে ঢুকে গেছে।... আহা! তাঁর কি দয়াই ছিল সকলের প্রতি! আজ তিনি বেঁচে থাকলে আরও কত লোককে কৃপা করতেন। আমার কেবলই তাই মনে হচ্ছিল। এখন ঠাকুর যেন আমার ঘাড় ধরে সেই অসমাপ্ত কাজ করিয়ে নিচ্ছেন।... কে মেয়ে, কে পুরুষ সেই জ্ঞানই আর আমার এখন নেই।’’[২৮]

বস্তুত বিশ্বের সব নারীমূর্তিতে তিনি শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করে ধন্য হয়েছিলেন। জগজ্জননীর প্রতি এই গভীর ভালবাসাকে—শ্রদ্ধাকে জগতের প্রতিটি নারীমূর্তিতে অকৃপণভাবে বিলিয়ে দেওয়াই যেন তাঁর মাতৃপূজার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন। সেই করুণার অম্লান কিরণে ধোয়া কয়েকটি ছবি পাঠকের সামনে সাজিয়ে রাখার প্রচেষ্টা করি।

বাইরে বিজ্ঞান মহারাজকে কঠোর মনে হলেও তাঁর মনটি ছিল ফুলের মতো কোমল। ভালবাসতেন সকলকেই। সে-ব্যাপারে উচ্চ-নীচ কোনও ভেদাভেদ ছিল না। বিশেষত দীক্ষা দিতে শুরু করার পর থেকে হয়তো বা তাঁর জীবনদেবতার আদেশেই করুণার এই প্রস্রবণ কূল ছাপিয়ে দিগ্‌বিদিক ভাসিয়ে দিয়েছিল। এলাহাবাদ আশ্রমে দাতব্য চিকিৎসালয়ের দায়িত্বে আছেন রায় নগেন্দ্রপ্রসাদ। ১৯৩৪ সালে বিহারের দারুণ ভূমিকম্পে দেশের বাড়ি ধূলিসাৎ হয়ে গেছে খবর পেয়ে ছুটে গেছেন। স্ত্রী-পরিবার সবাই সেখানে। কী করবেন এখন! যতদিন না নূতন গৃহের ব্যবস্থা করা যায় সবাইকে এখানে নিয়ে আসবেন—এরকম বিবেচনা করে মহারাজের সেবক বেণীকে একটা ভাড়া বাড়ি খুঁজতে বলেছেন। মহারাজ বেণীর কাছে খবর পেয়ে নগেন্দ্রবাবুকে বললেন, ‘‘আপনার বাড়ি খোঁজার দরকার নেই। আপনার পরিবার এখানে এলে আশ্রমেই থাকতে পারবেন।... ছয় মাসের মধ্যে এ-কাজ শেষ হওয়া চাই। বাড়ি তৈরি হয়ে গেলে ওঁরা ফিরে যাবেন।’’[২৯] যে-মহারাজ কোনও স্ত্রীলোককে আশ্রমের এলাকায় থাকতে দেন না তিনিই আবার বিনা বাক্যে ছয়-সাত জন স্ত্রীলোক এবং কয়েকটি শিশু সহ পুরো পরিবারকেই আশ্রমে বাস করার প্রস্তাব দিলেন! প্রজ্ঞাবান মহাপুরুষদের হৃদয়ের ভাব, মনের গতি কোন যুগে কে-ই বা বুঝতে পেরেছে! শুধু দেখা গেছে এই কঠিন সংসারে দুঃখী মানুষের উপর করুণা ও সহানুভূতি কখনও কখনও শ্রীগুরুর আদেশকেও যেন ভাসিয়ে নিয়ে যেত।

মহারাজের পিতৃহৃদয়ের অযাচিত স্নেহের প্রকাশও তাঁর দীক্ষিত কন্যাদের অভিভূত করেছে। দীক্ষা নেওয়ার পর বাড়িতে সত্যনারায়ণের পূজা করেছেন প্রতিভা বন্দ্যোপাধ্যায়—অন্তরে গভীর আকাঙ্ক্ষা গুরুদেবকে সেই রাতেই একটু প্রসাদ খাওয়াবেন। পূজা শেষ হতে রাত ৯টা বাজল। শীতের রাত। আশ্রমে মহারাজের ঘর সাড়ে-আটটায় বন্ধ হয়ে যায়। স্ত্রীর ইচ্ছা শুনে তাঁর স্বামী বললেন, দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, এত রাতে গেলে কপালে বকুনিই জুটবে। স্বামী সাহস

করলেন না। স্ত্রী কোন শক্তির প্রেরণায় নির্ভয়ে সেই রাতেই সিন্নি ও প্রসাদ নিয়ে আশ্রমে রওনা হয়ে গেলেন। মনে মনে ভাবছেন—বকেন তো বকবেন, তাঁকে আগে প্রসাদ না দিতে পারলে আমার পূজা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। যথারীতি আশ্রমে পৌঁছে দেখলেন দরজা বন্ধ। ধীরে ধীরে দরজায় ঠক ঠক করলেন। ভিতর থেকে সাড়া দিয়ে মহারাজ স্বয়ং দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। সব শুনে ভাগ্যবতী প্রতিভা দেবীকে বকলেন তো না-ই, বরং আশ্চর্য করে দিয়ে আশ্রমের ভেতর থেকে একটা চামচ আনতে বললেন। এক চামচ সিন্নি তিনি গ্রহণ করলেন। বাকি প্রসাদ তাঁর নির্দেশমতো উঠোনে ডালা চাপা রেখে মনে গভীর তৃপ্তি নিয়ে প্রতিভা ফিরে গেলেন।[৩০]

আবার দেখছি গুরু যেন মা হয়ে গেছেন। অকালে চলে যাওয়া মেয়ের মাকে এমন করে সান্ত্বনা দিচ্ছেন—ঠিক যেন নিজের মা। কতভাবে তাকে বোঝাচ্ছেন, মেয়ের জন্য কাঁদতে দিচ্ছেন না। বলছেন, ‘‘ওর জন্য খুব কেঁদেছেন কি? কাঁদবেন না বেশী, তা হলে ওর কষ্ট হবে। জানবেন, ও ঠাকুরের কাছে আশ্রয় পেয়েছে, কোনও জ্বালাযন্ত্রণা ওকে ছুঁতে পারবে না।’’[৩১] আর একবার সেই ভক্ত মহিলা বাড়িতে মহাষ্টমীর পূজা শেষ করে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে মঠের কাজের জন্য তাড়াতাড়ি চলে এসেছেন। মহারাজ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন কিছু খেয়ে এসেছেন কি না। তারপর সেবক বেণীকে ডেকে বললেন, ‘‘বেণী আভি যাও, মাঈজীকে লিয়ে চায়ে বানাও।’’[৩২] আরও কতভাবে কত মানুষের কাছে এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের মাতৃহৃদয়ের প্রকাশ উজ্জ্বল আলোর মতো আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ছেলেকে নিয়ে মা মঠে এসেছেন। গ্রীষ্মকাল—প্রচণ্ড রোদ, তৃষ্ণার্ত দুজনেই। মহারাজকে প্রণাম করে ঘরে বসেছেন। ঘরেও দারুণ গরম—তখন তো পাখাও নেই। আশ্রমের বাইরে আখের রস বিক্রি হচ্ছিল, মহারাজ সেবককে দিয়ে সেখান থেকে দু-ভাঁড় রস কিনে আনালেন। মা ও ছেলে দুজনেই পরিতৃপ্ত।[৩৩]

স্বামী অভয়ানন্দের স্মৃতিকথায় বিজ্ঞান মহারাজের করুণার আরও একটি ছবি পাই। মূল মঠবাড়ির যে-ঘরটিতে ভক্তদের দর্শন দিতেন সেখানে একটি চেয়ারে বিজ্ঞান মহারাজ বসে আছেন। ভরত মহারাজও ওই ঘরেই আছেন। মঠ সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে আলোচনা চলছে। এই সময় একটি নবদীক্ষিতা বধূ ঘরে ঢুকে কাতরভাবে বলল, ‘‘গুরুদেব, আপনার কাছে একটি নিবেদন আছে, যদি দয়া করে শোনেন!’’ মহারাজ ঈশারায় ভরত মহারাজকে বসতে বলে মেয়েটিকে বললেন, ‘‘বল মা, তোমার কী জানাবার আছে? সংকোচ করবার কোনও দরকার নেই।’’ শিষ্যা ধীরে ধীরে জানাল—সে শ্বশুরবাড়ির ছোট বউ, এমনিতেই সংসারে অনেক কাজ। তারপর ছোট বলে সবসময় গুরুজনদের ফাইফরমাস খাটতে হয়। ভোরবেলা থেকে সারাদিন কাজ চলে, এতটুকু অবসর নেই। এদিকে দীক্ষার সময় মহারাজ জপধ্যান আর প্রার্থনার বিষয়ে যা যা করতে হবে বলেছিলেন, কাজের চাপে যদি সেসব ঠিকঠিক করতে না পারে তাহলে তো অপরাধ হবে। মেয়েটি বলল, ‘‘এই অবস্থায় আমি কী করব, আপনি দয়া করে একটু বলে দিন।’’ মহারাজ সব শুনে সস্নেহে বললেন, ‘‘তাই তো, তুমি কী করবে! আচ্ছা, তুমি দু-বেলা খাও তো, সেই সময়ের উপর কেউ কি হাত দেয়?...

‘‘রাত্রে যখন শুতে যাও, তখনও নিশ্চয় হাতে কিছু নিজস্ব সময় থাকে?’’ বউটি জানাল তখন হাতে সময় একটু থাকলেও সেই সময় সে খুব ক্লান্ত থাকে। মহারাজ বললেন, ‘‘শোন। প্রত্যেক দিন খেতে বসার আগে স্থির হয়ে মনে মনে একবার তাঁকে ডাকবে, ঠাকুরের নাম করে, তাঁকে নিবেদন করে তবে খাবে। শুধু ভাত খাওয়ার সময় নয়,

যেকোনও জিনিস খাওয়ার আগে একবার তাঁকে ডেকে নেবে। আর রাত্রে যখন শুতে যাবে, তখন জপধ্যান করতে যদি না-ও পার, অন্তত সমস্ত অন্তর দিয়ে তাঁকে একবার প্রণাম জানাবে। তাতে যেন ভুল না হয়। আর যেদিন শরীরে ক্লান্তি থাকবে না, সেদিন পারলে একটু জপও করে নেবে।...পরে যখন ঠাকুর তোমার কাজের চাপ কমিয়ে দেবেন, তখন তুমিও জপধ্যানের সময় ধীরে ধীরে বাড়িয়ে নেবে, কেমন?” মহারাজের উপদেশে মেয়েটি খুব শান্ত ও আশ্বস্ত হয়ে গুরুদেবের চরণ বন্দনা করে বাইরে গেল। সে যেতেই—দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন তার বয়স্কা শাশুড়ি—তিনি ছুটে ঘরে এসে গুরুদেবকে ধরে বসলেন, “ওকে যেমন বললেন, আমারও ওই রকম একটা ব্যবস্থা করে দিন, মহারাজ! সংসারের চাপে আমিও... পূজার সময় করে উঠতে পারি না।” মহারাজ কিন্তু বললেন, “না, না,... আপনাকে কোন রেহাই দেওয়া হবে না।... ও ছেলেমানুষ, ওর কথা আলাদা, পরে ও ঠাকুরকে ডাকার সময় করে নেবে। আপনার বয়স হয়েছে, আপনি কেন পূজার সময় কমাতে চাইছেন? আপনার আবেদন অগ্রাহ্য।”[৩৪]

সংসারীদের উপর করুণা, সহানুভূতির বিরাম নেই কিন্তু সদ্‌গুরু প্রয়োজনে কঠোর। অথচ তাঁর আপাতকঠিন কথাতেও থাকত স্নিগ্ধ কৌতুকের সুর। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর পুরো পরিবার সহ মঠ-মিশনের বহু পুরনো ভক্ত। তিনি পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ-এ কাজ করেন। শাশুড়ি এবং স্ত্রীর কোলে শিশুকন্যাকে নিয়ে বেলুড় মঠে এসেছেন, মহারাজের সঙ্গে দেখা করবেন বলে অপেক্ষা করে আছেন। অনেকক্ষণ পরে মহারাজ গম্ভীর মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা স্নানঘরে ঢুকে গেলেন। যেতে গিয়ে হঠাৎ চোখ পড়ল মায়ের কোলে শিশুকন্যাটির উপর। ফিরে এলেন। মুহূর্তে অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। শিশুটির দিকে তাকিয়ে কতরকমের মুখ ভেংচানো, ঘুষি পাকিয়ে তার মুখের সামনে নিয়ে গিয়ে তাকে ভয় দেখানো—এসব কতরকমই না করতে লাগলেন। কে বলবে তিনি রামকৃষ্ণ মঠের প্রবীণ সঙ্ঘাধ্যক্ষ।... এরপর হাসতে হাসতে বিশ্বনাথবাবুর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, “তোমার সাত মেয়ে হবে।” ভদ্রমহিলা তো আঁতকে উঠলেন। করুণ সুরে অনুনয় করে বললেন, “না, না, মহারাজ, আমি ওদের মানুষ করতে পারবো না। তাহলে সব কটিকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। আপনি ব্যবস্থা করবেন।” এই কথা শোনামাত্র বালকবৎ মহাপুরুষ ভীষণ বিব্রত আর ত্রস্ত হয়ে—“কাজ নেই তোমার আর মেয়ে হয়ে—আমি বাপু ওসবের মধ্যে নেই বাবা।” এইসব বলতে বলতে একেবারে হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলেন।[৩৫]

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মুক্তপুরুষ তবু অন্তর ব্যাকুল হত সকলের জন্য—বিশেষ করে মেয়েদের কল্যাণচিন্তায়। তাদের ভগবানের দিকে নিয়ে আসার জন্য, তাঁর পবিত্র নাম দেওয়ার জন্য কী ব্যাকুলতা যে তিনি অন্তরে অনুভব করতেন! প্রীতিময়ী কর মনে দীক্ষার গভীর আগ্রহ নিয়ে মহারাজের কাছে ছুটে এসেছেন। ঘরে ঢুকে প্রণাম করতেই মহারাজ বললেন, “বসুন (সাধারণত সবাইকেই তিনি ‘আপনি’ সম্বোধন করতেন), কোথা থেকে আসছেন?” সেবককে বললেন, “এঁরা কবে আসবেন, একটা দিন বলে দাও।” সেবক দিন স্থির করে তারিখ বলে দিলে তাঁরা যখন প্রণাম করে ফিরে আসছেন তখন মহারাজ বললেন, “সাবধানে আসবেন যেন, অতদূর থেকে আসবেন!” সেবক বললেন, “আজকাল আসবার আর কোনো অসুবিধা নেই, সোজা... বাস হয়েছে।” মহারাজ তখুনি বলে উঠলেন, “বাস হলেই তো হয় না, অতদূর থেকে আসা—এক বার ওঠা, এক বার নামা।” অভিভূত হয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে

মহিলা ভাবছেন—জানাশোনা নেই, আলাপ নেই, এই অহেতুক দরদ—উদয়াস্ত নিজের কথা-ভাবা মানুষ আমরা কল্পনাই করতে পারি না।[৩৬]

প্রতিভা বসু লিখেছেন, দীর্ঘদিন পরে প্রিয়জনকে দেখলে মানুষ যেমন আনন্দিত হয় মহারাজও তেমনি খুশি হতেন তিনি স্বামী-পুত্র-কন্যাকে নিয়ে মঠে গেলে। তাঁদেরও মনে হত যেন বাবার কাছে এসেছেন। মহারাজ প্রথমেই খোঁজ নিতেন শরীর কেমন আছে; পুরনো দিনের কত কথা বলতেন, তাঁরা কিছু নিয়ে গেলে বারবার বলতেন—বাঃ বাঃ ভারি সুন্দর হয়েছে, খুব ভাল হয়েছে। বাচ্চাদের সঙ্গে কত যে আনন্দ করতেন! ডান হাতটি মুঠো করে হাসতে হাসতে বলতেন—তোমরা কী নেবে? ছোট বাচ্চারা হয়তো বলল—গাড়ি নেব। মহারাজ বলতেন—ধরো, ধরো। শিশুরা এগিয়ে এসে হাত বাড়াতেই মহারাজ বলতেন—ধরতে পারলে না তো, কোথায় উড়ে গেল! মিষ্টি এনে তাদের খাওয়াতেন। একবার প্রতিভা দেবী সঙ্গে কিছুটা গঙ্গামাটি নিয়ে গেছেন, মনে ইচ্ছা মহারাজের পায়ে ওই মাটি স্পর্শ করিয়ে বাড়ি নিয়ে যাবেন। মহারাজকে সেকথা জানাতে মহারাজ বললেন, “পায়ে মাটি ছোঁয়াবেন কী করে? পায়ে যে মোজা আছে।” তখন তিনি বললেন, “বাবা, মোজা খুলে মাটি ছুঁইয়ে নিয়ে মোজা আবার পরিয়ে দেব।” মহারাজ বললেন, “বেশ তো, তাহলে মাটি ছুঁইয়ে নিন।” তিনিও নিজের হাতে মোজা খুলে মাটি শ্রীচরণে বুলিয়ে নিয়ে আবার পরিয়ে দিলেন।[৩৭]

বৃদ্ধবয়সেও কত কষ্ট করে মহারাজ ‘মায়ী’-দের (মহিলাদের মায়ী বলতেন) অনুরোধে তাদের বাড়িতে গিয়ে তাদের ধন্য করেছেন। তাদের হাতে তৈরি খাবার খেয়েছেন, আবার যখন খেতে পারেননি তাদের অনুরোধে সঙ্গে নিয়েও এসেছেন। কখনও বলেছেন, “মুখে খাওয়া ছাড়া কি অন্য রকমে খাওয়া যায় না?”[৩৮] বারবার বলেছেন, “ভাল থাকো, কল্যাণ হোক, আমি প্রাণ থেকে আশীর্বাদ করছি।” মহারাজ মাঝে মাঝে নাকে নস্যি নিতে ভালবাসতেন, কোনও মহিলা তাঁর জন্য নস্যির শিশি আনলে তিনি হাতে নিয়ে বালকের মতো আনন্দ করেছেন। সামান্য জিনিসের উপর এই আকর্ষণ মনকে নামিয়ে রাখার জন্য। এই মহিলাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর পদসেবা করবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলে মহারাজ প্রার্থনা মঞ্জুর করে বলতেন, “আচ্ছা, দু-মিনিট সময় দিলাম, তার মধ্যে পা টিপে উঠে পড়তে হবে। নিন, তাড়াতাড়ি সেরে নিন।”[৩৯] হিমাচলসদৃশ আপাতকঠোর এই মূর্তিটির মধ্যে প্রেম ও করুণার যে-মন্দাকিনী ধারাটি বয়ে যেত তার স্পর্শ মাথায় নিতে পেরেছেন অনেকেই।

আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষ শিষ্যার আধ্যাত্মিক প্রতিবন্ধকতা দূর করেন বিবিধ উপায়ে। শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিতা, ভগিনী নিবেদিতার বিশেষ স্নেহভাজন গিরিবালা ঘোষের ভাইঝি সবিতা ঘোষ তখন ন’বছরের মেয়ে। পিসির সঙ্গে বেলুড় মঠে গিয়ে অন্যদের দীক্ষা নিতে দেখে মহারাজের কাছে দীক্ষা নেবে বলে বায়না ধরেছে। মহারাজ মৃদু হেসে বললেন, “তোর দীক্ষার মন্ত্র মনে থাকবে তো?” সেও জোর দিয়ে বলে, “ইংরেজি পদ্য, বাংলা পদ্য সব আমার মনে থাকে, দীক্ষার মন্ত্র নিশ্চয়ই মনে থাকবে।” মহারাজ অনুমতি দিলেন। দীক্ষা পেয়ে বালিকার খুব আনন্দ। দীক্ষা গ্রহণের তিন দিন পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুরঘরে জপ করতে বসে, কী আশ্চর্য, দীক্ষার মন্ত্র কোনওমতেই মনে পড়ল না। পিসিমাকে ভয়ে কিছু না বলে বাবার কাছে গিয়ে চুপিচুপি মন্ত্র ভুলে যাওয়ার কথা জানালে বাবা তাকে পরদিন মঠে নিয়ে গেলেন। মঠে পৌঁছে ছুটে মহারাজের ঘরে ঢুকে প্রণাম করে কাঁদতে কাঁদতে সবিতা জানাল, “আমার খুব পাপ

হবে।” মহারাজ ওর মাথায় হাত দিয়ে বললেন, ‘‘কী হয়েছে তোর?” সে বলল, ‘‘দীক্ষার মন্ত্র আমি ভুলে গেছি।” তখন তিনি জোরে হাসতে হাসতে বললেন, ‘‘তোর যে ইংরেজি পদ্য, বাংলা পদ্য সব মনে থাকে—তুই বলেছিলি? দেখলি তো অহংকার ভাল নয়।” তারপর একজন মহারাজকে ডেকে একটা ছোট বাক্স আনালেন এবং তার ভিতর থেকে একটা ছোট কাগজের টুকরো বার করে তার হাতে দিয়ে বললেন, ‘‘তোকে একটা জিনিস দিচ্ছি, ঠাকুরঘরে একটা জায়গায় এটা লুকিয়ে রেখে দিবি, কাউকে বলবি না বা দেখতে দিবি না।”[৪০] সবিতা কাগজটা খুলে দেখে ভেতরে তার দীক্ষার মন্ত্র লেখা। মহানন্দে গুরুকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই গুরু তার হাতে চাঙারি ভর্তি প্রচুর ফল, মিষ্টি ধরিয়ে দিলেন। সদ্গুরু অদ্ভুতভাবে শিষ্যার মন থেকে অভিমান-অহংকারের রেখাটি মুছে দিলেন।

ভক্ত মহিলারা মহারাজকে কত প্রশ্ন করতেন, সেইসব প্রশ্নোত্তরও কত সহজ, সরল, সরস! বরিশালের ডিস্ট্রিক্ট জজ বিজয়কৃষ্ণ বসুর (আই সি এস) স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবী (বাবুরাম মহারাজের ভাইঝি) মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘মনের চঞ্চলতা কি করে যাবে?” বিজ্ঞান মহারাজ উত্তর দিলেন, ‘‘কেন, চাবুক নিয়ে শাসন করবেন।” তার উত্তরে রাজলক্ষ্মী বলেছিলেন, ‘‘তা মহারাজ, চাবুক ত হাতে, মন অনেক দূর পালিয়ে গেছে, চাবুক মারবো কাকে?” এই উত্তরে মহারাজের হাসি দেখে কে![৪১] একদিন উপদেশ দেওয়ার সময় বললেন, ‘‘চেষ্টা করতে হবে যাতে সর্বদা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে তাঁর নাম করা হয়। নিঃশ্বাস নেবার সময় ‘রা’ প্রশ্বাসের সময় ‘ম’ এভাবে সর্বদা রাম, রাম জপ হয়। এভাবে করতে পারলে তখন আর কর-জপ বা মালা-জপের কোনও প্রয়োজন থাকবে না।”[৪২] একজন ভক্ত মহিলা প্রশ্ন করেছিলেন—‘‘ঠাকুরের মধ্যেই যদি সব দেবতা আছেন, তবে আর তাঁদের ভিন্ন নামে ডাকা কেন? এক ঠাকুরের নামে ডাকলেই তো হয়।” মহারাজ বললেন, ‘‘যাঁর যে নাম, তাঁকে সেই নামে ডাকাই তো ভাল। যার নাম ‘রাম’, তাকে ‘শ্যাম’ বলে ডাকলে সে সাড়া দেবে কেন?”[৪৩]

মহারাজ মহিলাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন তাদের বোঝার মতো করে। একদল নবদীক্ষিত মহিলার ইচ্ছা গুরুদেবের মুখের উপদেশ শুনবেন, একটু সঙ্গলাভ করবেন কিন্তু মঠে এলে ভক্তদের এত ভিড় যে তাঁর কাছে একটু বসা বা কথা বলবার বা শোনবার অবকাশই হয় না। মনে কত প্রশ্ন। গুরু সশরীরে রয়েছেন অথচ তাঁর পূত সঙ্গ এত দুর্লভ! সেদিন তাঁরা ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন মহারাজ সহাস্যবদনে একাই ঘরে বসে আছেন। প্রণাম সেরে উঠতেই তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘‘কি, উপদেশ? সহ্য করবে। বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগে দেখেছ না, তিনটে ‘স’ আছে—শ, ষ, স। সহ্য করবে।” একজন বললেন, ‘‘শুধু সহ্যই করব, কোনো সার্থকতা আসবে না?” মহারাজ একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন—মনটা যেন কোথায় চলে গেল। অন্তর্মুখভাবে বললেন, ‘‘সার্থকতা—ভগবানলাভ হলে।”[৪৪] অন্তর্যামী গুরু তিনি—অসুস্থ শরীরেও কৃপার বিরাম ছিল না। কত মহিলার কথা বলার ইচ্ছা থাকলেও বলার সাহস বা সুযোগ না পেয়ে শুধু নীরবে তাঁর ঘরে বসে থেকে উঠে যেতেন। কিন্তু আশ্চর্য, সকলেই তাঁর কৃপা অনুভব করতেন। তাঁর ক্ষণমাত্র সান্নিধ্যেই সকলের মন থেকে সংশয়, সন্দেহ কোথায় পালিয়ে যেত। অশান্ত মন শান্ত হয়ে যেত। মহারাজের শরীর তখন খুব খারাপ—ভক্তদের চরণ স্পর্শ করা বারণ। একজন মহিলা প্রণামান্তে স্পর্শ করতে গিয়েও হাত সরিয়ে নিলেন। মহারাজ তাঁর দিকে এমন করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন যে তাঁর হৃদয় অপার শান্তিতে ভরে গেল।

স্নেহের এমন প্রকাশ দেখেও কি বিশ্বাস করা যায় যে তিনিই একদিন মহিলাদের দিকে পেছন ফিরে বসে প্রণাম নিয়েছেন! প্রকৃতপক্ষে এইসব মহাপুরুষদের আচার-আচরণ সত্যিই আমাদের বোধের সীমার বাইরে। তাই 'উত্তররামচরিত' বলেছেন, 'লোকোত্তরানাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি'—লোকোত্তর পুরুষদের মনের গতি কে-ই বা জানতে পারে!✠

তথ্যসূত্র

১। স্বামী চেতনানন্দ, *স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতিকথা* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০১৪), পৃঃ ৪৮ [এরপর, *স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতিকথা*]
২। তদেব, পৃঃ ১৬৬
৩। তদেব
৪। তদেব পৃঃ ১৮২
৫। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, *স্বামী বিজ্ঞানানন্দ* (শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ : মুঠীগঞ্জ, এলাহাবাদ, ১৩৫৪), পৃঃ ১০৯ [এরপর, *স্বামী বিজ্ঞানানন্দ*]
৬। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ২৭৮
৭। *দ্রঃ স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতিকথা*, পৃঃ ৫৯-৬০
৮। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ৬০
৯। দ্রঃ তদেব
১০। সম্পাদনা ও সংকলন : সুরেশচন্দ্র দাস ও জ্যোতির্ময় বসু রায়, *প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৩), পৃঃ ৩১৯-২০ [এরপর, *প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে*]
১১। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ৩২০
১২। *দ্রঃ স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতিকথা*, পৃঃ ১৬৯
১৩। তদেব, পৃঃ ১২৯
১৪। সংকলন স্বামী অপূর্বানন্দ, *সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ* (উদ্বোধন কার্যালয় : ২০০৯), পৃঃ ৪৮ [এরপর, *সৎপ্রসঙ্গে*]
১৫। দ্রঃ *স্বামী বিজ্ঞানানন্দ*, পৃঃ ৬১
১৬। *সৎপ্রসঙ্গে*, পৃঃ ১১১
১৭। তদেব, পৃঃ ১০৪
১৮। *সৎপ্রসঙ্গে*, পৃঃ ১০৪
১৯। *প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে*, পৃঃ ৩০
২০। দ্রঃ *স্বামী বিজ্ঞানানন্দ*, পৃঃ ১০৫
২১। *স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতিকথা*, পৃঃ ১১২
২২। *প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে*, পৃঃ ১১৩
২৩। তদেব, পৃঃ ৩১, ২১১
২৪। *স্বামী বিজ্ঞানানন্দ*, পৃঃ ১১৫-১১৬
২৫। *স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতিকথা*, পৃঃ ৯২
২৬। *সৎপ্রসঙ্গে*, পৃঃ ১২০
২৭। *প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে*, পৃঃ ৩৮-৩৯
২৮। তদেব, পৃঃ ৫৯-৬০
২৯। তদেব, পৃঃ ১২৯
৩০। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ১৪৩
৩১। তদেব, পৃঃ ১৪৭
৩২। তদেব, পৃঃ ১৪৫
৩৩। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ১৪৬
৩৪। তদেব, পৃঃ ২৫২-৫৪
৩৫। তদেব, পৃঃ ৯১-৯২
৩৬। *স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতিকথা*, পৃঃ ২২২-২৩
৩৭। তদেব, পৃঃ ১৯৬
৩৮। *স্বামী বিজ্ঞানানন্দ*, পৃঃ ১২৪
৩৯। *প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে*, পৃঃ ১০৬
৪০। *স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতিকথা*, পৃঃ ২৩৮-৩৯
৪১। *স্বামী বিজ্ঞানানন্দ*, পৃঃ১৪৫
৪২। তদেব, পৃঃ ১৯৮-৯৯
৪৩। *স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতিকথা*, পৃঃ২২৪
৪৪। তদেব